# শিক্ষা অধিদফতরের মহাপরিচালককে আমি ধন্যবাদ জানাব, যদি ...

নির্মল সেন

কদিন পূর্বে পত্রিকায় দেখেছিলাম একটি খবরের শিরোনাম। শিরোনামটি হচ্ছে 'শিক্ষাভবনের এখনও সেই পুরনো চেহারা।' 'শিক্ষক তোগান্তি ও হয়রানি কমেনি।' 'ঘুষ লেনদেনের প্রক্রিয়া বদলেছে।' 'সিন্ডিকেট চক্র এখনও সক্রিয়।'

দেশে জরুরী অবস্থা চলছে। ঘুষ-দুর্নীতিবিরোধী অভিযান জোরেশোরে চলছে। তাই শিক্ষাভবনের বর্ণাঢ্য দুর্নীতির সব কাহিনী আগের মতো প্রকাশ্যে শোনা যায় না। কিন্তু চালচিত্রের তেমন কোন পরিবর্তন হয়নি। জানা যায় যে, 'শিক্ষাভবনের' দুর্নীতি একদা ছিল কল্পকথার মতো। সেখানকার অবস্থা ছিল প্রথমত ঘুষ, দ্বিতীয় ঘুষ, আর সবশেষেও ঘুষ। একদা মানুষের মুখে মুখে শোনা যেত শিক্ষাভবনের ইট, কাঠ, বালু, চেয়ারটেবিলও ঘুষ খায়। সেখানে ছিল প্রকাশ্যে ঘুষ নেয়ার বিধান। তখন মনে হতো ঘুষ নামক কথাটি যেন 'বৈধ শব্দ'। অনেককে বলতে শুনেছি, শিক্ষাভবনের নাম 'পাল্টিয়ে 'অশিক্ষা-কুশিক্ষা ভবন' লেখা উচিত। কথাটি হাসির খোরাক যোগায় বটে, কিন্তু কথাটি মিথ্যা নয়।

জানা যায়, দুর্নীতিবিরোধী অভিযান ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নজরদারি ও চাপে পরিস্থিতি কিছুটা পাল্টে গেছে। প্রকাশ্যে উৎকোচ চিত্র কোথাও কোথাও ফিকে হয়ে এসেছে। কিন্তু শিক্ষক হয়রানি ও অনিয়মের চিরচেনা ধারা এখনও চলছে। মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদফতরের মহাপরিচালক অধ্যাপক নাজিমউদ্দিন সাহেব এ কথা অকপটে স্বীকারও করেছেন। অভিযোগের সুরেই তিনি বলেছেন, 'সারাদেশ দুর্নীতিতে আচ্ছন্ন, শিক্ষাভবনও এর ব্যতিক্রম নয়'। তিনি এও বলেছেন, লোকবল বাড়ানোয় অবস্থার কিঞ্চিত পরিবর্তন হতে পারে।

জানা যায়, রাজনৈতিক দল ক্ষমতায় থাকাকালে সিবিএ নেতাদের মাধ্যমে ঘুষ দেয়া-নেয়া চলত। এখন লেনদেনের চিত্র হচ্ছে 'টপ সিক্রেট', 'হাই বিড' 'হাই এমাউন্ট' ইত্যাদি কোডের মাধ্যমে। ঘুষের অঙ্কের পরিমাণ গুরুত্বের ভিত্তিতে এসব কোড নাকি ব্যবহার করা হয়। এর পর শুরু হয় সেন সবখাব। কর্মকর্তারা নাকি এখন আর আগের মতো সরাসরি উৎকোচ দাবি করেন না। আগে টাকা দিয়ে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কাজ করা যেত। এখন টাকা সরাসরি দাবি করা যায় না বলে বুঝতে হয়। কর্মকর্তাদের টেবিলে টেবিলে ফাইল চালাচালির এক অদৃশ্য মায়াজালে আটকে ফেলা হয় সব কাজ। এ অবস্থায় উৎকোচ লেনদেনের পর্ব চলে অফিসের বাইরে। আর দাবির তুলনায় উৎকোচের পরিমাণ কম হলে তোগান্তির মাত্রা বহুগুণ বেড়ে যায়। জানা যায়, ২০০৪ সালে কাগজপত্র জমা দিয়ে আজও টাইম স্কেল পাননি জনৈক শিক্ষক। বিধান অনুযায়ী ৮ বছর কাজ করার পর টাইম স্কেল পাওয়ার কথা। কিন্তু ২০ বছরও তাঁর ভাগ্যে কোন টাইম স্কেল জোটেনি। এ শিক্ষক নাকি দু'জন অফিস সহকারীকে সাত হাজার টাকাও দিয়েছেন। ২০০৫ সালে নতুন আর একজন সহকারীকে টাকা না দেয়ায় এ যাবত ১৪/১৫ বার ঢাকায় এসেও আজও তাঁর ভাগ্যে টাইম স্কেল জোটেনি। এমনিভাবে আর এক শিক্ষক গত বছরের জুলাই মাসে টাইম স্কেলের কাগজপত্র জমা দিয়ে এ পর্যন্ত দূর এলাকা থেকে পাঁচবার এসেও কাজ হয়নি। দূর থেকে আসার পরও ১টার পূর্বে অফিসে ঢুকতে পারেননি। এর পরে দু'দু'বার কর্মকর্তার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েও তাঁকে অফিসে পাননি। জনৈক কলেজ অধ্যক্ষকে কলেজ কমিটিতে বিদ্যোৎসাহী সদস্য নিয়োগের জন্য ঘুরতে হয়েছে মাসের পর মাস। এ পর্যন্ত ঐ একই ব্যাপারে ছ'বার ঢাকায় এসেও এখনও তাঁর কাজ হয়নি। এ ধরনের চিত্র একটি, দু'টি নয়। খোঁজ নিলে এ ধরনের শত শত ঘটনার সন্ধান মিলবে। সন্ধান মিলতে পারে হাজার হাজার ঘটনারও।

আরও জানা যায়, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সিন্ডিকেট চক্র আবারও সক্রিয় হয়ে উঠেছে। অবশ্য এ ব্যাপারে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব বলেছেন, সিন্ডিকেট ভেঙে দেয়া হয়েছে। কিন্তু কার্যত শিক্ষাভবনের নানা অনিয়মের হোতাকে নাকি প্রায়ই শিক্ষাভবনে দেখা যায়।

জানা যায়, ঘুষ লেনদেন প্রক্রিয়া এখন সম্পন্ন হয় অফিসে নয়। এ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয় হাইকোর্ট মাজার বটতলায় আর অফিস আওয়ার শেষে সচিবালয়ের উত্তর পাশের হোটেলগুলোতে। সেখানে শিক্ষাভবনের কর্মকর্তাদের নাকি আড্ডাও বসে, আর সে আড্ডাতেই ঘুষের লেনদেন সম্পন্ন করা হয়।

ক'দিন পূর্বে পত্রিকায় দেখেছি অতিরিক্ত শিক্ষা সচিব শিক্ষা ক্যাডারের কিছু 'সৎ কর্মকর্তা' খুঁজছেন মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদফতরে প্রেরণের জন্য। মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদফতরের মহাপরিচালকও বলেছেন, ৫০ জন লোকবল বাড়ানোর প্রস্তাব শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদফতরের মহাপরিচালক অকপটে বলেছেন, আগে বদলির দায়িত্বে যাঁরা ছিলেন, তাঁরা দুর্নীতি করেছেন। আমি দায়িত্ব নেয়ার পর শিক্ষা মন্ত্রণালয় আমাকে যে দায়িত্ব দিয়েছে আমি যথার্থভাবে দায়িত্ব পালনের চেষ্টা করে যাচ্ছি। কিন্তু মহাপরিচালক সাহেব যা-ই বলুন না কেন, শিক্ষকদের বক্তব্য হচ্ছে শিক্ষাভবনের ইট-বালিও ঘুষ খায়।

২৫ সেপ্টেম্বর প্রকাশিত একটি পত্রিকার এক প্রতিবেদনের শিরোনাম ছিল '২১ দিনে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দুর্নীতিমুক্ত করার উদ্যোগ।' খবরটি পড়েছি আর মনে মনে হেসেছি। সে রিপোর্টটিতে আছে তিন সপ্তাহের মধ্যে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদফতরকে দুর্নীতিমুক্ত করার ঘোষণা দিয়েছেন উক্ত অধিদফতরের মহাপরিচালক অধ্যাপক মোঃ নাজিমউদ্দিন। তিনি বলেছেন, শিক্ষাভবনে অভিযোগ ডেস্ক স্থাপন করা হবে। আগামী দু'সপ্তাহের মধ্যে অধিদফতরের যে কোন অনিয়ম ও দুর্নীতি সংক্রান্ত অভিযোগ দিতে সংশ্লিষ্ট শিক্ষকদের প্রতি আহ্বান জানানো হবে। পরবর্তী সপ্তাহের মধ্যে অভিযোগের সত্যতা যাচাই করে দুর্নীতির মূলোৎপাটন করা হবে। খবরটি চমকপ্রদ বটে।

আমি খবরটি পড়ে হেসেছি এ জন্য যে, শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড। জাতির মেরুদণ্ড গড়ার ব্যাপারে পরিচালক কর্তৃপক্ষের কাজ করে শিক্ষা অধিদফতর। অথচ সেই অধিদফতর যা ঘুষ, দুর্নীতি নানা অনিয়মে জর্জরিত তা যদি মাত্র ২১ দিনে দুর্নীতিমুক্ত হয়, তবে এর চেয়ে বড় সুখবর আর কী থাকতে পারে! এ ক্ষেত্রে আমার প্রশ্ন— মাত্র ২১ দিনে যে কাজটি সমাধা করা সম্ভব, তা এতদিন ফেলে রাখা হয়েছিল কেন? আমার আরও প্রশ্ন— ২১ দিন কেন, ২১ সপ্তাহেও কি তা পারবেন? পারবেন কি তা ২১ মাসেও? যদি পারেন, আমি দু'হাত তুলে আপনাকে সাধুবাদ জানাব। জানাব ধন্যবাদও।

**যেহেতু আপনি আর মাত্র ২ মাসেরও কম সময় এ পদে আছেন; সেহেতু বলছি, শতকরা ২৫ ভাগ পরিবর্তন আনতে পারলেও আপনাকে আমি ধন্যবাদ জানাব। আপনি পরিবর্তন আনতে সফল হোন, আন্তরিকভাবে আমি এ কামনাই করছি**

শিক্ষা অধিদফতর নিয়ে যুগ যুগ ধরে অভিযোগের অন্ত ছিল না। দিনে দিনে অভিযোগ বেড়েছে, কমেনি। যেখান থেকে ছড়িয়ে পড়ার কথা শিক্ষার আলো, সেখানেই বাসা বেঁধেছে সবচেয়ে বেশি দুর্নীতি। এক সময় শোনা যেত, শিক্ষা বিভাগ দুর্নীতিমুক্ত। আজ যে কারও কাছে যদি প্রশ্ন করা হয়— কোন বিভাগ সবচেয়ে বেশি দুর্নীতিগ্রস্ত? উত্তর পাওয়া যাবে— 'শিক্ষা বিভাগ'। ঢাকার শিক্ষাভবন যেন এক নরক। যে শিক্ষকরা ছাত্রদের আদর্শ ও সৎ হওয়ার শিক্ষা দিয়ে থাকেন, শিক্ষাভবনে এসে তাঁরা হন অসহায়। মনে হয় তাঁরা যেন এতিম। ঘুষ ছাড়া নিজের চাকরি সংক্রান্ত কাজটিও করতে পারেন না। দ্বারে দ্বারে তাঁদেরকে ঘুরতে হয় এতিমের মতো। ধমক খেতে হয় চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীরও। ওখানের কর্মচারীদের দাপট অনেক। অনেক অধ্যক্ষ, প্রধান শিক্ষক, সুপারকে কর্মচারীদের ধমকও খেতে হয়। টাকা ছাড়া ওখানে কাজ হবে— এ ভরসা কেউ পান না। তাই অনেক ক্ষেত্রেই শিক্ষকরা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারী না চাইতেই টাকা দিয়ে দেন।

শিক্ষাভবনে দেশের দূর-সুদূর থেকে শিক্ষকরা আসেন। আসেন নানা কাজ নিয়ে। তাঁরা সবাই জানেন, নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্তি, শিক্ষক বদলি, পদোন্নতি, পে-স্কেল, পেনশন ইত্যাদি কাজে ঘুষ দিতে হয়। অথচ ভাবতে অবাক লাগে, যে কর্মকর্তারা এ ঘুষ গ্রহণ করেন তাঁরাও শিক্ষক। আর তাঁরা শিক্ষা-ক্যাডারের কর্মকর্তা। শুনেছি 'কাকের মাংস কাক খায় না।' আমার তো মনে হয়, এ কথা ঐ কর্মকর্তারা ভুলে গেছেন।

১৯৮২ সাল থেকে এ যাবত বার বার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জরিপ হয়েছে। এ জরিপকার্য পরিচালনা করে শিক্ষা, তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো (ব্যানবেইস)। ব্যানবেইসের এক জরিপে জানা যায়, সব শর্ত বিবেচনা ও মূল্যায়ন করা হলে প্রায় ১০ হাজার বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কোন না কোনভাবে অযোগ্য ও অসম্পূর্ণ। সরকারী নীতিমালা মেনে প্রতিষ্ঠিত দেশে মোট অনুমোদিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রয়োজনের তুলনায় ৫৮০৬টি বেশি রয়েছে। এদের মধ্যে স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা সবই রয়েছে। এগুলোর প্রায় সবই ঘুষের বিনিময়ে অনুমোদন দিয়েছে শিক্ষা বিভাগ ও শিক্ষা বোর্ড। আর ঘুষের বিনিময়েই এগুলো এমপিওভুক্ত করা হয়েছে। এমনকি নামকাওয়াস্তে অবকাঠামো দেখিয়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত করে ভুয়া শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন তোলা হয়েছে। ভুয়া শিক্ষক-কর্মচারীদের এমপিওভুক্ত করা শিক্ষা অধিদফতরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের একটি লাভজনক ব্যবসা। আর ভুয়া শিক্ষকদের বেতন তোলা ঐসব প্রতিষ্ঠানেরও একটি লাভজনক ব্যবসা। এমনকি ১৯৯৩ সালের ও ১৯৯৯ সালের শিক্ষা জরিপে এমন শত শত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব ধরা পড়েছিল, যে প্রতিষ্ঠানের কোন অবকাঠামোই নেই। এ কারণে শত শত প্রতিষ্ঠানের সরকারী অনুদান স্থগিতও করা হয়েছিল। অথচ মোটা অঙ্কের অর্থের বিনিময়ে বা মোট বেতনভাতার সিংহভাগের বিনিময়ে শিক্ষা অধিদফতর ঐসব প্রতিষ্ঠানের অনুদানের অর্থ তড়িঘড়ি ছাড় করেছিল। পক্ষান্তরে অস্তিত্ব ও সুনাম আছে এমনি বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ঘুষের লেনদেন না করায় বছরের পর বছর তোগান্তির শিকার হয়েছে— যার বহু প্রমাণ আমার কাছে আছে। জানা যায়, আর্থিক লেনদেনের বিনিময়ে এমপিওভুক্ত হওয়ার কারণে ৬০ থেকে ৭০ হাজার অতিরিক্ত শিক্ষক রয়েছে। বিশ্বব্যাংকের এক জরিপে জানা যায়, দেশের ৩৮ শতাংশ শিক্ষক বেতনভাতা তুলতে ঘুষ দেন। সরকারী-বেসরকারী বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মূল বেতনের ২ থেকে ৫ ভাগ পর্যন্ত ঘুষ দিতে হয় বেতন তোলার সময়।

আরও জানা যায়, শিক্ষা অধিদফতরে ঘুষ-দুর্নীতির প্রাতিষ্ঠানিকীকরণে সেখানকারই একশ্রেণীর অসৎ কর্মকর্তা-কর্মচারী জড়িত। এরা এতটাই সংঘটিত যে, এদের ক্ষমতা সব সরকারের আমলেই স্থায়ী। এরা সিবিএ নিয়ন্ত্রণ করে। এমনকি সিবিএ নিয়ন্ত্রণকারী চতুর্থ শ্রেণীর এক কর্মচারী সিবিএ নেতার ঢাকায় আছে পাঁচতলা বাড়ি। তিনি হাঁকান নিশান গাড়ি। তাঁর নিজের সর্বসাকল্যে বেতন ৫ হাজার টাকার মতো। অথচ তিনি তাঁর ব্যক্তিগত গাড়ি চালককে বেতন দেন ৫ হাজার টাকা। অন্তত এক যুগ ধরে শিক্ষা অধিদফতর তাঁর হাতে জিম্মি। আমার তো মনে হয়, তাঁর দাপট রোধ করা কঠিন।

জানি না, শিক্ষা অধিদফতরের মহাপরিচালক প্রফেসর নাজিমউদ্দিন সাহেব আলাদীনের চেরাগ হাতে পেয়েছেন কিনা! জানি না, ২১ দিনে তিনি কতটুকু পারবেন? তিনি যতই বলুন না কেন, আমার তো মনে হচ্ছে ২১ দিনে সব দুর্নীতির উচ্ছেদ কোনক্রমেই সম্ভব নয়। কারণ এর শেকড় অনেক গভীরে। তবে হ্যাঁ, বর্তমান পরিস্থিতির শতকরা ৫০ ভাগও যদি উন্নতি হয় তবেও জনাব নাজিমউদ্দিন সাহেব আমি আবারও বলছি, আমি দু'হাত তুলে আপনাকে অভিনন্দন জানাব। শতকরা ৫০ ভাগ কেন, যেহেতু আপনি আর মাত্র ২ মাসেরও কম সময় এ পদে আছেন; সেহেতু বলছি, শতকরা ২৫ ভাগ পরিবর্তন আনতে পারলেও আপনাকে আমি ধন্যবাদ জানাব। আপনি পরিবর্তন আনতে সফল হোন, আন্তরিকভাবে আমি এ কামনাই করছি। আর আপনার উদ্যোগের জন্য আপনাকে জানাচ্ছি ধন্যবাদ।

*[লেখক : সাংবাদিক ও রাজনীতিক]*

দৈনিক জনকণ্ঠ
তারিখ ... 12 OCT 2007
পৃষ্ঠা ... কলাম ...